IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

নারায়ণ দেবনাথের কমিক্সে ‘বাস্তব’-এর নির্মাণ

সর্বজিত ঘোষ

পি.এইচ.ডি গবেষক

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারতবর্ষ

Abstract: Comics is such a genre, from the very beginning that has subverted the relam of first degree reality, as a second degree of reality is created through the visual component of this genre. Unlike the word-written reality, this visual reality is not a factor of the reader's imagination or concentration. This certain characteristics of comics has influenced it to create a own dimension of reality throughout times. Veteran artist Narayan Debnath also shaped his own version of reality, both visually and through the plot, while creating comics for Bengali chlidren periodicals. He has created such a world, where the idea of 'child' does not refrain from engaging with so-called adult matters — surely which is not common among his predecessors in Bengali visual-narrative scene. Children in his comics indulge into serious crimes as well as in 'childlike' mischieves. Whenever the country goes to war, Bnatul The Great, a character with enormous physical strength, also goes to teach the terrorists a lesson. But Bnatul is also a next-door superhero. So, the question arises, is there any basic structure present in the reality which Narayan Debnath created? How does this reality confront the first degree reality of the child reader? Are there any political position or ideas present behind that shaping of the reality? How is the power structure of the first degree reality is addressed in this version? These are some of the questions regarding Narayan Debnath's reality in comics, whose answers are being searched in this paper.

***Index Terms* - Child, Young-adult, comics, Narayan Debnath, Reality.**

I. ভূমিকা

কমিক্স এমন এক সংরূপ, সূচনাকাল থেকেই পার্থিব বাস্তবতার মধ্যে যা অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে চলেছে। শব্দনির্মিত সাহিত্যের চেয়ে শব্দ ও দৃশ্যের সম্মিলনে নির্মিত সংরূপ কমিক্স অনেক বেশি করে এই অন্তর্ঘাত ঘটাতে সক্ষম। কারণ, শব্দের পাশাপাশি রেখাঙ্কিত দৃশ্যও যখন কোনও একটি ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, হাতেগরম পার্থিব বাস্তবতাকে ফুঁড়ে ভিন্ন মাত্রার আরেকটি বাস্তবতা প্রতীয়মান হয়ে ওঠে — দৃশ্যমানতার জন্যই তার অন্তর্ঘাতক্ষমতা পাঠকের একাগ্রতা বা কল্পনাশক্তির উপর পুরোপুরি নির্ভর করে না। কমিক্সের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটির কারণেই হয়ত বারবার আমরা দেখব, বাস্তবতার মাত্রার বিচিত্র অতিক্রমণ কমিক্সে ঘটতে দেখা গিয়েছে। সেই অতিক্রমণ কখনও হয়েছে কাহিনিভিত্তিক, আবার কখনও তা দৃশ্যগত। বাংলা কমিক্সের ক্ষেত্রেও নারায়ণ দেবনাথ তাঁর নিজস্ব বাস্তবতার নির্মাণ করে নিয়েছেন। একেকটা ধারাবাহিক কমিক্সে তাঁর এই বাস্তবতার নির্মাণ একেরকমের। আমরা তাঁর নির্মিত এই বিভিন্ন বাস্তবতার তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করব তাঁর প্রস্তাবিত সাধারণ বাস্তবের প্রকৃতি।

II. গবেষণা পদ্ধতি

তুলনামূলক পাঠ-সমালোচনা পদ্ধতিতে নারায়ণ দেবনাথ প্রণীত বিভিন্ন কমিক্সের সমালোচনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা পত্রিকায় প্রকাশিত কমিক্সের ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন ঘটছে, তা-ও অনুসন্ধান করা হয়েছে। শ্রী নারায়ণ দেবনাথের একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, যা এই নিবন্ধের লেখক নিজেই নিয়েছিলেন।

III. নারায়ণ দেবনাথের কমিক্সে ‘বাস্তব’-এর নির্মাণ

বাঁটুলের গল্পে আমরা দেখতে পাই, বাঁটুল এমন এক চরিত্র, যার গায়ে গুলি বোমা ছুরি কিছুই লাগে না। যে কোনো আঘাতেই সে অনাহত। এই বিশেষ ক্ষমতাবলে বলীয়ান হয়ে বাঁটুল অপরাধী ধরতে নামে, নামে যুদ্ধক্ষেত্রে। যুদ্ধে বাঁটুল বেশ কয়েকবার গিয়েছে। ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ কিংবা আরো পরে হওয়া অপারেশন বিজয়, কার্গিল যুদ্ধে আমরা বাঁটুলকে অংশ নিতে দেখি। যুদ্ধে লড়বার বাঁটুলের কিছু নিজস্ব ছক আছে। প্রায় প্রতিটি যুদ্ধেই বাঁটুল শত্রুপক্ষের গোলাকেই আবার তাদের দিকে ফিরিয়ে দেয়, সেই গোলা তাদেরই আঘাত করে। কিন্তু, সেই বিস্ফোরণে কারো মৃত্যু নারায়ণ দেবনাথ দেখান না, দেখান শত্রুসেনার কাপড় ছিঁড়ে যাচ্ছে, তারা আহত, ভয়ার্ত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, এই ছক লেখক নিজেই

অনেক জায়গায় ভেঙে দেন। ১৯৬৫-এর যুদ্ধে বাঁটুলকে দেখি পেট্রোল ট্যাঙ্কার নিয়ে শত্রুপক্ষের ঘাঁটিতে ঢুকে পড়তে, দেখি প্যাটন ট্যাঙ্ক গদার মতো তুলে তাদের হামলা করতে।[১] অথচ, এখানেও কারো মৃত্যু দেখা যায় না। শুকতারার সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে তিনি যখন বাঁটুলকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নামিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব পান,[২], তাঁর প্রাথমিক উদ্বেগের জায়গা হয় অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাঁটুলকে ভিড়িয়ে দেওয়া আইনবিরুদ্ধ হবে কিনা। 'শিশু'র যে ধারণা তিনি নিজে অন্যান্য লেখায় তৈরি করবেন, তার সঙ্গে যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণকে তখনই মেলানো যায়, যখন বুঝি, বাস্তবের প্রত্যক্ষতা থেকে শিশুকে সরিয়ে রাখতে তিনি চাননি। অথচ, যুদ্ধে সরাসরি পক্ষ নেওয়ার মধ্যে দিয়ে হিংসার প্রতি যে প্রকাশ্য সমর্থনের নজির তিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরবেন, তা শুধু বাঁটুলের কমিক্সেই নির্মিত নারায়ণী অতিরঞ্জনের মাত্রাবোধকে লঙ্ঘন করে। আমরা দেখি, একাত্তরের যুদ্ধের কমিক্সে প্রতি পাতায় ছবির সংখ্যা কমে চারটি হয়ে যায়।[৩] স্বাভাবিকভাবেই এর ফলে প্রতিটি খোপে মানুষের চেহারা ও ঘটনাবলী মাপে অনেকটাই বড় হয়ে যায়, তুলনামূলক বড় আকার নিয়ে দেখা দেয় যুদ্ধের ধ্বংসলীলাও। এই গল্পে ধ্বংসের তীব্রতা অন্যান্য গল্পের তুলনায়, এমনকি বাঁটুলের অন্যান্য যুদ্ধের গল্পের তুলনায় অনেক বেশি। এই গল্পে লেখক সরাসরি মৃত্যু দেখান। আমরা দেখি বাঁটুলের গায়ে লেগে ফেরত যাওয়া গুলি এক খানসেনাকে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে, এই প্রথম এবং শেষবার তিনি রক্তপাত আঁকেন। এই গল্পেই আমরা দেখি ব্রিজ ভেঙে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক নদীতে পড়ে যাচ্ছে। এই ধ্বংসের ছবির তীব্রতা বাঁটুলের অন্যান্য যুদ্ধের গল্পের তুলনায় অনেক বেশি।

বাঁটুল যেখানে থাকে, সেখানকার ভূ-রাজনৈতিক পরিচয় নির্মাণে নারায়ণ দেবনাথ কিছু পৃথক উপাদানকে একত্র করেন। বাটুঁলের শহরের কাছেই জঙ্গল, নদী, পাহাড়ও রয়েছে, আবার আদিবাসীরাও সেখানে কাছাকাছি থাকে।[৪] এই জঙ্গলে এমনকি বাঘও থাকতে দেখছি আমরা। থাকতে দেখছি ভূত। ভূতেদের জারিজুরিও অবশ্য বাঁটুলের কাছে খাটে না। একটা গল্পে দেখি এক ভূতের লম্বা জিভ দিয়েই বাঁটুল তাকে বেঁধে ফেলে।[৫] বাটুলের গল্পে ভূতেরা কখনোই উপকারী চেহারায় ধরা দেয় না।

বাঁটুলের গল্পে যেসব অপরাধীকে আমরা দেখি, তারা সমকালকে ভীষণভাবে ধারণ করে। একটা গল্পে দুজন অপরাধীকে আলোচনা করতে দেখি তাদের অস্ত্র নিয়ে, একজন বলে, তার অস্ত্র সে পেয়েছে পুরুলিয়া থেকে।[৬] আমাদের মনে পড়ে যায় পুরুলিয়ায় অস্ত্রবর্ষণের কথা। আবার একটা গল্পে ভজা-গজা এক কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্যার্থে চাঁদা তুলে তা দিয়ে ফুর্তি করার পরিকল্পনা করে।[৭] শ্রমিকরা ধর্মঘট তুলে নিতে চায়, কারণ ধর্মঘটে দেশের ক্ষতি হচ্ছে --- এরকম একটি বক্তব্য লেখক শ্রমিকদের মুখে বসিয়ে দেন। শ্রমিক আন্দোলন, কিংবা বৃহত্তর অর্থে প্রত্যক্ষ রাজনীতির থেকেই একধরমের শান্তিকামী দূরত্ব বজায় রাখা মধ্যবিত্তের শ্রেণিঅবস্থান — কাজেই, ধর্মঘট তথা শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে বোঝাপড়ায় লেখক যে নিজের মধ্যবিত্ত রাজনীতিবিমুখ অবস্থানকে অতিক্রম করেন না, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবার, এই ধর্মঘট তুলে নেওয়ার খবর পেয়ে ভজা-গজা তা আটকাতে যায় এবং বাঁটুলের হাতে নাকাল হয়। লেখকের শ্রেণিগত অবস্থান পেরিয়েও একটা এমন বাস্তবের ছবি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেখানে শ্রমিকদের স্বার্থ কেউ দেখে না, শ্রমিকরা বোড়ে হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বাঁটুলের গল্পে ছবির ধরনে কিছু বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। প্রথমদিককার বাঁটুলে ছবির ধরণ অনেকটা নারায়ণ দেবনাথের 'পাদপূরণ' সিরিজের ছবির মতো --- বিশেষত বাঁটুল ছাড়া অন্যান্য চরিত্রের চেহারায়, মৌখিক অভিব্যক্তিতে রেখার ব্যবহার অনেকটা ভাঙাচোরা। এই ভাঙাচোরা রেখা অনেক বেশী দৃঢ় হচ্ছে ১৯৭০-এর সময় থেকে, সবার অভিব্যক্তি ও চেহারাই গোটা গোটা করে আঁকা হচ্ছে।

বাঁটুলের বাস্তবের নির্মাণে বিজ্ঞানের কিছু প্রাথমিক নিয়মের সীমা লেখক নিজের মতো করে কম-বেশি করে নেন। বাঁটুল ফুঁ দিয়ে ফুটবল খেলতে পারে, পা দিয়ে খেলতে গেলেই বল ফেটে যায়।[৮] ক্রিকেট বল মেরে বাঁটুল এতদূর আকাশে পাঠিয়ে দিতে পারে, যেখানে বলের চারপাশে বরফ জমে গিয়ে অনেক বড় এক গোলা হয়ে তা ফেরত আসে।[৯] বাড়িতে আগুন লাগলে বাঁটুল তা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়। আবার আমরা দেখি, ফুটন্ত আলকাতরা মেখে বাঁটুল দুধ দিয়ে চান করে পরিষ্কার হচ্ছে।[১০] উটপাখির পালক দিয়ে ডানা তৈরি করে দিয়ে তার সাহায্যে উড়তেও দেখি বাঁটুলকে।[১১] এভাবে যে বাস্তব নারায়ণ দেবনাথ বাঁটুলের গল্পে তৈরি করেন, তার অভিমুখ একটাই --- বাঁটুলের ক্ষমতার অসীমতাকে বারবার প্রতিষ্ঠা করা।

নারায়ণ দেবনাথের আরেকটা স্বাতন্ত্র্য তাঁর কমিক্সে বিভিন্ন ধ্বনির ব্যবহার। মানুষের আর্তনাদ, বিভিন্ন সংঘর্ষের শব্দ, ঘুঁষি খাওয়ার শব্দ --- এসবই খুব যত্নের সঙ্গে উল্লেখ করে দিয়েছেন লেখক। অনেক সময়েই সংলাপের বদলে এইসব ধ্বনির ব্যবহার হচ্ছে। আরো কেউ রেগে গেলে যেমন "গর্‌র্‌র্‌" শব্দ করছে, কিংবা কোনো কিছু পড়লে "দড়াম" শব্দ হচ্ছে, বিস্ফোরণের শব্দও হচ্ছে "দড়াম", আবার বাঁটুল যখন দড়ির ফাঁস ছুড়ে এরোপ্লেনকে ধরছে, তখনও এরোপ্লেন চালকের আর্তনাদ অব্দি "আঁইইই" শব্দে শোনাচ্ছেন লেখক। পরের দিকে এইসব শব্দের ব্যবহার ও রকমফের আরো বাড়তে দেখব। যেমন, বাঁটুলের একটা গল্পে দেখব, বাঁটুলের ছুঁড়ে দেওয়া আঠা একদল কয়েদীর উপরে এসে পড়ায় তারা যথাক্রমে "গ্লাব" ও "আগ্লহ্‌" শব্দ উচ্চারণ করছে।[১২] এইধরনের ধ্বনির ব্যবহারে কমিক্সের একটা পৃথক সাউন্ডস্কেপ নারায়ণ দেবনাথ তৈরি করছেন। এই সাউণ্ডস্কেপ আমরা তাঁর সব কমিক্সেই পাবো, এটা তাঁর অন্যতম পরিচায়ক একটা বৈশিষ্ট্য।

হাঁদাভোঁদার কমিক্সেও আমরা বাঁটুলের মতো আঁকার ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাই। হাঁদাভোঁদার প্রথম যে কমিক্সটি বেরোচ্ছে শুকতারার ১৩৬৯ শ্রাবণ সংখ্যায়[১৩], সেখানে দেখব ছবিতে খুব স্পষ্ট ডিটেলিং নেই, ছবি অনেক বেশি সাজেস্টিভ, রেখাও বাঁটুলের প্রথম দিককার ছবির মতো ভাঙাভাঙা। হাঁদাভোঁদার চেহারাতেও একটা বিশেষ ভাষা লক্ষ্য করা যায়। হাঁদাভোঁদার চেহারা আরো পালটাচ্ছে ১৯৬৪-তে এসে, আবার পাল্টাচ্ছে ১৯৭১-এ এসে। '৭১-এ এসে আমরা দেখব ছবিতে ডিটেলিং বাড়ছে, রেখা অনেক দৃঢ় হচ্ছে।

হাঁদাভোঁদায় অনেকবার আমরা ভূত দেখতে পাই। হাঁদাভোদার ভূতের দুটি ধরন আছে — উপকারী ভূত ও অপকারী ভূত। একটা গল্পে আমরা দেখি বৃষ্টিতে হাঁদাভোঁদা একটা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, সেখানে যে বৃদ্ধ ভূত থাকেন, তিনি হাঁদাভোঁদাকে মনমতো খাবার এনে খাওয়াচ্ছেন। হাঁদাভোঁদা যখন তাঁর ভূত পরিচয় জানতে পেরে পালায়, তখন তিনি লম্বা হাত বাড়িয়ে খাবারের থালা এগিয়ে থাকেন।[১৪] কিন্তু বেশিরভাগ গল্পেই ভূত এমন উপকারী

নয়, তারা হয় মাছ চুরি করে খায়, কিংবা মাথা ফাটিয়ে ঘিলু বের করে নিতে চায়। এসব অপকারী ভূতেদের হাত থেকে ভোঁদার বুদ্ধিতেই বারবার দুজনে উদ্ধার পায়। এই ভূতেরা রামনামে ভয় পেয়ে পালায় কখনও, আবার কখনও ভোঁদা এমন কিছু খাইয়ে দেয় যাতে ভূতেদের পেট খারাপ হয় — যেমন ক্যাস্টর অয়েল বা লঙ্কাবাটা। ভূতেদের মধ্যেও আমরা মানুষের সমাজের মতো নানা স্তরভেদ দেখতে পাই। ভূতের রাজাও এমনকি একটা গল্পে আসেন, যিনি এককালে গুপিবাঘাকে বর দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন[১৫]। এছাড়া মামদো, ব্রহ্মদত্যি, স্কন্ধকাটা, মেছো ভূত ইত্যাদি রকমফের দেখা যায়। এই ভূতেদের খাবারের বর্ণনাও কিছু কিছু পাওয়া যায় --- মানুষের রক্ত, মাথার ঘিলু, ইঁদুর পোড়া, মানুষের মাংস পোড়া ইত্যাদি।[১৬] নন্টেফন্টেতে ভূতের উল্লেখ বারবার আসে, কিন্তু সেখানে একবারও ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। নন্টেফন্টেকে দেখা যায় ষড় করে কাউকে ভূতের দেখাতে, কিংবা ভূতের ভয়কে কোনো বুজরুকি ধরার কাজে ব্যবহার করতে। যে 'কিশোর ভারতী' পত্রিকায় নন্টে-ফন্টে প্রকাশিত হত, সেটি ঘোষিতভাবে বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রসারে ব্রতী থেকেছে। কাজেই, ভূতকে প্রত্যক্ষ বাস্তবতার শরিক হিসেবে নন্টে-ফন্টেতে দেখা যায়না, বরং যেকোনও ভৌতিক ব্যাপারের পেছনেই যে মানুষের উদ্দেশ্য বা আরসাজি কিংবা স্রেফ কল্পনা থাকে, এহেন একটি সত্যের কাঠামো এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হাঁদাভোঁদায় আমরা পুলিশকে বারবার নাকাল হতে দেখি। হাঁদাভোঁদা বেশীরভাগ সময়েই পুলিশকে অনিচ্ছাকৃত আঘাত করে ফেলে। কখনও তাদের গায়ে রঙ দিয়ে দেয়, কখনও বল দিয়ে আঘাত করে। পুলিশের এই ভূমিকা আমরা নন্টেফন্টের গল্পেও দেখব। নন্টেফন্টের একটা গল্পে দেখব পুলিশ কমিশনার এসে বল খেলা নিয়ে আপত্তি জানাচ্ছেন, তাঁর বাড়ির জানলার কাঁচ ভেঙে যাচ্ছে বল লেগে।[১৭] খেলতে গিয়ে এভাবে পুলিশের বা প্রতিবেশীদের বিরাগভাজন হওয়ার একটা ছক হাঁদাভোঁদা আর নন্টেফন্টে --- দুটো সিরিজেই আছে। আমরা বারবার দেখি, শিশু বা কিশোরের খেলার উপযুক্ত মাঠ নেই। তারা বারবার রাস্তায় খেলতে যায়, আর নানারকম গোলমাল পাকায়। বাচ্চাদের খেলার জায়গার অভাবের কথা নারায়ণ দেবনাথ বারবার বলছেন। পটলচাঁদ দ্য ম্যাজিশিয়ান সিরিজের একটা গল্পে[১৮] দেখি, একটা জায়গায় কারখানার জন্যে গাড়ির গ্যারেজ করার কথা, কিন্তু পটলচাঁদের জাদুতে সেখানে প্রবেশ করামাত্র সবার মনে খেলার ইচ্ছে হচ্ছে। আইসক্রিম বিক্রেতা বিনেপয়সায় আইস্ক্রিম দিচ্ছেন, এক ট্রাকওয়ালা বালি ফেলে বেলাভূমি তৈরি করে দিচ্ছেন, দুই বিরোধী নেতা ছাতা দিয়ে ক্রিকেট খেলতে নেমে পড়ছেন। শেষে সকলে মিলে ওখানে একটা পার্ক বানিয়ে দিচ্ছেন। কলকাতা-হাওড়ার মতো শহরে বাচ্চাদের খেলার মাঠ ক্রমশ কমে যাওয়ার কথা বিংশ শতকের চতুর্থ পাদে অনেক গল্প-উপন্যাসেই পাওয়া যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়ণের সাঁড়াশিচাপের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে এই সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে, যার প্রাভব সমকালীন শিশু-কিশোরের উপরেও পড়েছে। নারায়ণ দেবনাথ শিশুদের বিভিন্ন সমস্যার মতো এটাকেও খেয়াল করেছেন।

খাবার নারায়ণ দেবনাথের প্রায় সব কমিক্সেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাঁটুলের খাবারের পরিমান অনেক বেশি --- সে গামলা থেকে বিরিয়ানি খায়, যেদিন তার পেট ভরা, সেদিনও সে এক ডজন ডিম দিয়ে অমলেট খেয়ে প্রাতরাশ করে। ভজা-গজা বারবার বাঁটুলের খাবার লুকিয়ে কিংবা খেয়ে ফেলার চেষ্টা করে। খাবার নিয়ে দ্বন্দ্ব বারবার ফিরে এসেছে নারায়ণ দেবনাথের লেখায়। হাঁদাভোঁদাতেও আমরা হাঁদা ও ভোঁদার মধ্যে খাবার নিয়ে মারামারি, ঝগড়া, খাবার সরিয়ে ফেলা, কেড়ে নেওয়া ইত্যাদি দেখেছি। নন্টে ফন্টেও দেখছি কেল্টুর থেকে খাবার লুকিয়ে রাখছে, কিংবা সুপারের আনা খাবার চুরি করছে, দুধ চুরি করছে কেল্টু। যে সব খাবার নিয়ে এইসব দ্বন্দ্ব, তার কোনোটাই সাধারণ খাবার নয়। বিরিয়ানি, চপ কাটলেট, আইসক্রিম, দই, সন্দেশ, কেক --- এইসব খাবারের কথা বারবার আসে। হাঁদাভোঁদা শুরু হয় ১৯৬২-তে, বাঁটুল ১৯৬৫ আর নন্টে ফন্টে ১৯৬৯-এ। ষাটের দশকে পশ্চিমবঙ্গে তীব্র খাদ্যাভাব চলছে, খাদ্য আন্দোলনে মানুষ গুলি খেয়ে মরেছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা যে নারায়ণ দেবনাথের শিশু-কিশোর চরিত্রদের এমন সব খাবার নিয়ে এত মাথা ঘামাতে দেখি, যা আমাদের মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় আসে না। বাস্তব পরিস্থিতে অস্বীকার করে নারায়ণ দেবনাথ এমন এক বাস্তব নিজে তৈরি করেন, যেখানে লোভনীয় সব খাবার প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, এবং গল্পের শেষে কখনও বাঁটুল, কখনও ভোঁদা, কখনও নন্টেফন্টে সেসব খাবার আনন্দ করে খাচ্ছে।

নারায়ণ দেবনাথের নানা গল্পে আমরা বিভিন্ন অদ্ভুত যন্ত্রপাতির সন্ধান পাই। কখনো সেসব অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কখনও বা অন্য কোনো কাজে। যেমন, বাঁটুল ও ভক্কারাসুর গল্পে[১৯] আমরা দেখি, খুব বড় ও সুঁচালো এক হাতুড়ি বাঁটুলকে মারতে ব্যবহৃত হচ্ছে, যার নাম মহাতুড়ি। নারায়ণ দেবনাথ কারিগরির নানা নিদর্শন বিভিন্ন গল্পে রাখছেন। বাঁটুলকে আমরা দেখি নিজের সাইকেল নিজে বানিয়ে নিতে। হাঁদাভোঁদা বারবার কাঠের বিভিন্নরকমের গাড়ি বানায়। এটা-ওটা জুড়ে নানা যন্ত্রপাতি বানিয়ে নিতেও দেখি হাঁদাভোঁদাকে --- যেমন ওয়াশিং মেশিনের অংশ খুলে হাঁদা মহাকাশে যাওয়ার যন্ত্র বানায়।[২০] ব্যুমেরাং বানাতে দেখি হাঁদাভোঁদাকে। পিসেমশাইকে দেখি একটা এমন যন্ত্র ব্যবহার করতে, যা দিয়ে দূরের জিনিস কাছে নিয়ে আসা যায় নিজে স্থান পরিবর্তন না করেই।[২১] নারায়ণ দেবনাথের অনেক গল্পে আমরা এরকম মানুষের পরিশ্রম কমানোর বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার দেখব --- কিন্তু সেই ব্যবহারের ফল কখনোই খুব একটা সুখকর হতে দেখি না আমরা। আমরা দেখি, কখনও হাঁদা, কখনও কেল্টু সেসব যন্ত্র নিয়ে নানা গোলমাল পাকাচ্ছে। এই দ্বন্দ্বসূত্রের উপরে ভিত্তি করে একটা গোটা কমিক্স সিরিজ আছে নারায়ণ দেবনাথের --- 'ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু'। সেখানে দাদু নানারকম যন্ত্র কিংবা পদার্থ আবিষ্কার করেন, যাদের অনেকগুলিরই মূল উপযোগিতা শ্রমলাঘবে। অথচ খাঁদু সেসব নিয়ে গোলমাল পাকায়। চটজলদি জমে যাওয়া সিমেন্ট নিয়ে সে বিভিন্ন মানুষের উপরে অত্যাচার করে, শেষে নিজে জব্দ হয়।[২২] নারায়ণ দেবনাথ যে বাস্তব নির্মাণ করছেন, সেখানে এইসব অদ্ভুত যন্ত্র ও পদার্থ আছে বটে, কিন্তু তাদের ব্যবহারের ফল খুব স্পষ্টভাবেই লেখক বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সেসব ব্যবহার করতে গিয়ে গোলমাল পাকছে, মানুষ নাকাল হচ্ছে।

পশুদের সাথে মানুষের সহাবস্থানের সম্পর্ককে বারবার দেখিয়েছেন নারায়ণ দেবনাথ। তাঁর আকা অনেক পশুই মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধি ধরে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাঁটুলের কুকুর ভেদো --- সে অনেক গল্পেই ভজা গজার কূটবুদ্ধি ধরে ফেলে ও তাদের বিষম নাকাল করে। শুঁটকি-মুটকির একটা গল্পেও আমরা দেখি, তাদের পোষা কুকুর বুড়োকে তাদের বাবা পিকনিকে নিয়ে যেতে চান না। তখন শুঁটকি-মুটকি বুড়োর কেনেলের নীচে চাকা লাগিয়ে তাদের গাড়ির পেছনে বেঁধে নেয় ও বুড়োকে নিয়ে যায় পিকনিকে।[২৩] পশুদের নিয়ে আলাদা করে কমিক্স করেছেন নারায়ণ দেবনাথ --- 'বুদ্ধিমান কুকুর' ও 'বাহাদুর বেড়াল'। সেখানেও আমরা বারবার দেখি পশুরা মানুষের থেকে ন্যূন নয়, বরং বুদ্ধির লড়াইতে মানুষই হেরে যাচ্ছে পশুর কাছে। এখন,

এই হারের একটা ছক আছে। সেইসব মানুষকেই আমরা হারতে দেখি, যারা পশুদের নানাভাবে নাকাল করে। যেমন, শুকতারার ফাল্গুন ১৩৮৯ সংখ্যায় আমরা দেখি, বাহাদুর বেড়াল পার্কের বেঞ্চে বসে ঘুমোচ্ছিল, এক পুলিশ তার লেজ ঢুকিয়ে দেয় চটজলদি জমে যাওয়া কোনো মিশ্রণের ডিব্বায়। বাহাদুর সেই ডিব্বাটা পুলিশের মাথাতেই আছাড় মেরে ভাঙে।[24] নিজের তৈরি করা বাস্তবতায় পশুদের মধ্যে এভাবে বিবিধ মানবিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করেন নারায়ণ দেবনাথ, তাদের মানবায়নের মাধ্যমে জায়গা করে দেন শিশুর সহমর্মিতার জগতে। এই মানবায়ন বিশিষ্ট হয়ে ওঠে বাহাদুর বেড়ালের কমিক্সে। বাহাদুরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে এটা স্পষ্ট, নারায়ণ দেবনাথের 'শিশু'র যে ধারণা, বাহাদুর বেড়াল সেই ধারণা থেকেই জন্ম নিয়েছে। তার যেমন অনেক বুদ্ধি, যারা তাকে নাকাল করে তাদেরও সে যেমন নাকাল করে, তেমনই অনেক সময় সে নিজেই দুষ্টুমি করতে গিয়ে বিপদে পড়ে। অর্থাৎ, নারায়ণ দেবনাথ আবার একবার কেবল কোনো বিশেষ অ্যাজেন্ডা নিয়ে কমিক্স আঁকেন না, বরং তিনি শৈশবের নানারকম উপাদানকে একত্র করতে চান। তিনি যেমন দুষ্টুমি দেখান, বড়োদের হাতে শিশুর অনর্থক শাস্তি পাওয়াও দেখান। তাঁর নিজের তৈরি বাস্তবে শিশু কখনও জেতে, কখনও হারে, দুষ্টুমির শাস্তি কখনও পায়, আবার কখনও দুষ্টু বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে জিতেও যায় --- আর এই জেতা হারার মাঝে প্রতিবার জিতে যায় শৈশব। একটা নির্দিষ্ট সময়চিহ্ন ধারণ করেও নারায়ণ দেবনাথের বাস্তব তাই চিরকালীন শৈশবের ক্রিড়াভূমি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

IV. উপসংহার

'রাজনীতি' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে বুঝেছেন নারায়ণ দেবনাথ। সাধারণ শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালি যে অর্থে রাজনীতি বোঝে --- রাজনীতি মানেই কোনো দলকে প্রকাশ্য সমর্থন করা ও সেই দলের কর্মসূচিতে প্রত্যক্ষ যোগ দেওয়া। আমজনতা এই অর্থেই রাজনীতি বোঝে, এই অর্থেই কিছু মানুষের পেশা তাদের কাছে 'রাজনীতি করা', এই অর্থেই তারা আপন সন্তানদের বারণ করে রাজনীতি করতে। অথচ, রাজনীতির এই বিশেষ অর্থসংকোচন তো স্বয়ম্ভূ নয়, তা একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফসল। নারায়ণ দেবনাথ শ্রেণিগত অবস্থানের কারণে সেই প্রক্রিয়ায় নির্মিত মতাদর্শকে এড়াতে পারেননি, বারবার তাই আমাদের তিনি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তার লেখায় রাজনীতির কথা নেই। অথচ, তাঁর সাহিত্য আশ্চর্যভাবে 'রাজনীতি' শব্দটির এই বিশেষ অর্থসংকোচনকে অস্বীকার করে। তাঁর লেখায় রাজনীতি আছে, এবং তা আছে এই অর্থসংকোচন ঘটবার চেয়েও প্রাথমিক অর্থে --- তিনি বারবার লেখায়, ছবিতে ক্ষমতার বিরুদ্ধে কথা বলেন। বাঁটুল, প্রশাসনের প্রতি যার প্রশ্নহীন আনুগত্য, এমনকি তার গল্পেও বারবার আমরা পুলিশের, প্রশাসনের এমন চেহারা দেখি, এমনভাবে তাদের ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে উঠতে দেখি --- যে আমাদের মনে হয়, নেহাত শিশুসাহিত্য না হলে এসব নিয়ে হইচই পড়ে যেত।

একইভাবে আমরা দেখি, শিশুসাহিত্য বলতে এতদিনের প্রচলিত যেসব ধারণা বাংলা সাহিত্যে ছিল, একদিকে জেঠামশাইসুলভ এক অবস্থান থেকে শিশুকে উপদেশভারে জর্জরিত করা, অন্যদিকে চাঁদ-তারা-ফুল-পাখিময় 'অপাপবিদ্ধ' শিশুর জগতের নির্মাণ --- নারায়ণ দেবনাথ এই দুই ধারার বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর শিশুরা শুধুই যে দুষ্টু তা নয়, তারা পাকা অপরাধীর মতো অপরাধ করে অনেক জায়গায়, এবং সেসব ছাপা হয় শুকতারার মতো পত্রিকায় --- জরুরি অবস্থার সময়েও যে পত্রিকা "Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine vide No. 321(9)-T. B. C. (dated 14th August, 1971, 2B-20G/71)"।[25] এই পত্রিকাতেই শিশুদের ইস্কুলে পাঠানোর গল্প যেমন রয়েছে বাঁটুলের, তেমনই ইস্কুলকে নাকচ করবার কিছু গল্পও জায়গা পেয়েছে। আর ভরে রয়েছে হাঁদা ভোঁদার দুষ্টুমি --- সেসব গল্পের শেষে জিতে যাওয়া ভোঁদা অব্দি যে যে পন্থায় জেতে, সেসব যে অভিভাবকেরা শিশুদের খুব একটা অনুসরণে বাধ্য করবেন, এমন নয়। নন্টে ফন্টের গল্পেও এমন এক শিক্ষককে দেখি, যিনি আদর্শ শিক্ষক তো ননই, বরং নানারকম অসততায় দুষ্ট। তাহলে সরকার নির্ধারিত শিশুপাঠ্য পত্রিকায় এমন ছকভাঙা গল্প কীভাবে স্থান পেল? শিশুদের ভবিষ্যতের সুনাগরিক, কর্মী করে তোলবার দায়িত্ব নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে যে পত্রিকা, তা কীভাবে নন্টে-ফন্টেকে সহ্য করল? কীভাবে তা দীর্ঘকাল জনপ্রয়তার শীর্ষে রইল? এর উত্তর খুঁজতে আমাদের আবার নারায়ণ দেবনাথ এবং তাঁর রাজনীতিবোধের কাছে ফিরতে হবে। যতই তিনি পুলিশের ভুঁড়ি আর অকর্মণ্যতাকে ব্যঙ্গ করুন, প্রশাসনকে নাকাল হতে দেখান, বৃহত্তর অর্থে কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের শরিক তিনি ছিলেন না। যে মতাদর্শ নির্দিষ্ট অবস্থান নিতে শেখায়, নারায়ণ দেবনাথ সেই মতাদর্শ নিয়ে ভাববার প্রয়োজনই বোধ করেননি। বাঁটুলে তাই পুলিশকে হাজার ব্যঙ্গ করা হলেও সেনাবাহিনীকে অত্যন্ত মর্যাদার আসনে বসানো হয়, বাঁটুল যুদ্ধে দেশ এবং সেনাবাহিনীর আজ্ঞাবহ হয়ে উঠতে দ্বিধাবোধ করে না। যেভাবে বারবার বিপরীত পক্ষকে নাকাল হতে দেখানো হয়, বিপরীত পক্ষকে সন্ত্রাসবাদী, হানাদার হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হয় এবং সেইসূত্রে বাঁটুলের হাতে তাদের ধ্বংসপ্রাপ্তি জায়েজ করে তোলা হয়, এতে এটুকু স্পষ্ট হয়ে ওঠে, একটা নির্দিষ্ট জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ থেকে নারায়ণ দেবনাথ যুদ্ধকে দেখছেন।

আসলে নারায়ণ দেবনাথ ভাঙতে কোনোদিনই চাননি। নিয়মের প্রতি আনুগত্য বারবার তাঁর লেখায় ভাঙবার উপক্রম হয়, অথচ সেই ভাঙন ঠিক আটকে দেন লেখক। কিন্তু, এও সমানভাবে সত্যি, ভজা-গজা তাদের প্রবলতম প্রতিপক্ষ বাঁটুলকে নাকাল করার চেষ্টায় কখনো হাল ছাড়ে না। বারবার হেরে ভূত হয়েও তারা নতুন উদ্যমে ফিরে আসে। একইভাবে হাল ছাড়ে না কেল্টু, শোধরায় না হাঁদা, শিক্ষা হয় না খাঁদুর। যারা নিয়ম ভাঙতে চায়, তাদের শোধরানোর কোনো অলৌকিক সমাধান লেখক দেন না, বরং নিয়ম ভাঙতে না দেওয়ার সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও আদতে সেসব নিয়মভঙ্গকারীকে কোনোদিন হারতে দেখান না লেখক: তাদের বারবার ফিরে আসা আদতে কখনো হার না মানার সামিল। নিয়ম ভেঙে ছত্রখান করে দেওয়া নারায়ণ দেবনাথের উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁর শ্রেণিগত অবস্থান তাঁকে তা করতেও দিতো না। মধ্যবিত্তের নির্দিষ্ট নীতিবোধের সঙ্গে সংঘাত হলেই যে লেখা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তার উদাহরণ শুঁটকি-মুটকি। কাজেই, একেবারে চিৎকার করে নিয়ম না ভেঙে নারায়ণ দেবনাথ এমন কৌশলে যাবতীয় নিয়ম, শীলতা, ভব্যতাকে আক্রমণ করলেন, শিশু-কিশোরের বর্তমান আর ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন তুললেন, শিশু-কিশোরের মধ্যেকার হিংসাকে সরিয়ে রাখলেন না --- যাতে সরাসরি প্রশ্ন না উঠতে পারে, অথচ শিশু-কিশোরের মনে সমগ্র ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিশুর, কিশোরের পৃথক কোনো কাল্পনিক জগত নির্মানের ভণ্ডামি তিনি করেননি --- বরং তারা যে বাস্তবের অংশ, যে বাস্তব তাদের চেতনাতেও ধরা দেয়, তাকে কিছুটা ওলোটপালোট করে এমন এক নির্মাণ ঘটালেন, যা নেহাত শিশুসাহিত্য বলে অপাংক্তেয় করে না রাখলে মধ্যবিত্ত সাহিত্যের পাঠকদের ভারি অসুবিধে। একই কারণে, হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুল, নন্টে-ফন্টের মতো প্রচারিত হল না পটলচাঁদ দ্য ম্যাজিশিয়ান --- তাতে খুব স্পষ্ট করে রাজনৈতিক নেতাদের ভণ্ডামির কথা বলা আছে, আর তাঁর

বিপরীতে মানবতাবাদী সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করতে দেখা যাচ্ছে লেখককে --- সেই সমাধান আসছে ম্যাজিকের মাধ্যমে। অর্থাৎ, লেখক প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিচ্ছেন, বাস্তবে রাজনৈতিক নেতাদের ভণ্ডামি তাঁকে পীড়িত করে বটে, কিন্তু তার কোনো বাস্তব সমাধান, রাজনৈতিক সমাধান তাঁর জানা নেই, সমাধানের জন্যে দ্বারস্থ হতে হচ্ছে ম্যাজিকের। সমাধান দেওয়া লেখকের কাজ কিনা, এ বিষয়ে দীর্ঘ বিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু সমস্যাকে দেখিয়ে প্রশ্ন তোলা যে লেখকের অন্যতম কর্তব্য, এতে কোনো দ্বিমত নেই। এই প্রশ্নগুলো শিশুসাহিত্যে তোলবার দুঃসাহসেই কি পটলচাঁদের মতো চরিত্র পত্রিকার আনুকূল্য পেল না? এই প্রশ্ন তোলবার মধ্যেই নিজের শ্রেণিগত মতাদর্শ, মধ্যবিত্ততা পেরিয়ে লেখক অন্যতম সফল অন্তর্ঘাতটি ঘটালেন বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যে --- শেষে যে নিয়ম ভাঙা পড়ে না কখনোই, এই ছবি দেখতে দেখতে আর নিয়ম ভাঙায় প্রবৃত্ত চরিত্রদের হাল না ছাড়তে দেখতে দেখতে পাঠক হয়তো একদিন প্রশ্ন করে বসবে নিয়মের এই অটলতাকে --- আর এই প্রশ্নের পূর্বাভাস বিন্দুমাত্র পাবেন না অভিভাবক, যিনি সরকার-নির্ধারিত পত্রিকা কিনে দিচ্ছেন শিশুকে। শৈশব ও কৈশোরের সঙ্গে সম্পৃক্ত জগতে যে ক্ষমতাকাঠামো বিদ্যমান, নারায়ণ দেবনাথ খোদ সেই ক্ষমতাকাঠামোটিতে বারংবার অন্তর্ঘাত ঘটাবেন — বারংবার নাকাল হবে এঁচড়েপক্ক বিরক্তিকর দাদা, কড়া শিক্ষক, হস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট, রাশভারি আত্মীয়। এভাবেই নারায়ণ দেবনাথ হয়ে উঠবেন বাংলা শিশুসাহিত্যের অন্যতম সফল গেরিলাযোদ্ধা।

V. কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রী নারায়ণ দেবনাথকে, সাক্ষাৎকারের জন্য আমায় সময় বরাদ্দ করেছেন তিনি সানন্দে। পাশপাশি কৃতজ্ঞতা জানাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সহপাঠীদের, তাঁদের সাহায্য ছাড়া এই কাজটি সম্ভব হত না।

তথ্যসূত্র:

১. নারায়ণ দেবনাথ, *নারায়ণ দেবনাথ কমিক্স সমগ্র প্রথম খণ্ড*, স. দেবাশীষ দেব ও শান্তনু ঘোষ, কলকাতা: লালমাটি, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৮।

২. সাক্ষাতকার: নাম- নারায়ণ দেবনাথ, বয়স- ৯৬, পেশা- সাহিত্যিক, ঠিকানা- মন্দিরতলা, শিবপুর, হাওড়া, তারিখ- ০৫.০৫.২০১৭, গ্রহীতা- সর্বজিৎ ঘোষ, স্থান- শিবপুর, হাওড়া, https://billigi.blogspot.com/2021/02/blog-post.html।

৩. নারায়ণ দেবনাথ, *নারায়ণ দেবনাথ কমিক্স সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড*, স. চণ্ডী লাহিড়ি ও শান্তনু ঘোষ, কলকাতা: লালমাটি, অক্টোবর ২০১১, পৃ. ৫৭-৬৪।

৪. নারায়ণ দেবনাথ, *নারায়ণ দেবনাথ কমিক্স সমগ্র তৃতীয় খণ্ড*, স. প্রদীপ গড়াই ও শান্তনু ঘোষ, কলকাতা: লালমাটি, কলকাতা: জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১২৩-১২৪।

৫. নারায়ণ দেবনাথ, *বাঁটুল দি গ্রেট ৮*, কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃ. ৩১-৩২।

৬. নারায়ণ দেবনাথ, *বাঁটুল দি গ্রেট ১২*, কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃ. ৩১।

৭. নারায়ণ দেবনাথ, *বাঁটুল দি গ্রেট ৬*, কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃ. ১৩-১৪।

৮. নারায়ণ দেবনাথ, *নারায়ণ দেবনাথ কমিক্স সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড*, স. চণ্ডী লাহিড়ি ও শান্তনু ঘোষ, কলকাতা: লালমাটি, অক্টোবর ২০১১, পৃ. ৮৭-৮৮।

৯. নারায়ণ দেবনাথ, *বাঁটুল দি গ্রেট ৩*, কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃ. ৩১-৩২।

১০. নারায়ণ দেবনাথ, *বাঁটুল দি গ্রেট ৯*, কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃ. ২৪।

১১. নারায়ণ দেবনাথ, *বাঁটুল দি গ্রেট ৯*, কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃ. ৯-১০।

১২. নারায়ণ দেবনাথ, *বাঁটুল দি গ্রেট ৯*, কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃ. ১৬।

১৩. নারায়ণ দেবনাথ, *নারায়ণ দেবনাথ কমিক্স সমগ্র প্রথম খণ্ড*, স. দেবাশীষ দেব ও শান্তনু ঘোষ, কলকাতা: লালমাটি, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৭৫।

১৪. নারায়ণ দেবনাথ, *হাঁদা ভোঁদা সমগ্র*, কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, জুলাই ২০১১, পৃ. ২২৫-২২৬।

১৫. নারায়ণ দেবনাথ, *হাঁদা ভোঁদা সমগ্র*, কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, জুলাই ২০১১, পৃ. ২২১-২২২।

১৬. নারায়ণ দেবনাথ, *হাঁদা ভোঁদা সমগ্র*, কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, জুলাই ২০১১, পৃ. ২১৮।

১৭. নারায়ণ দেবনাথ, *নন্টে আর ফন্টের নানান কীর্তি নবম পর্ব*, কলকাতা: পত্রভারতী, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ২৩।

১৮. নারায়ণ দেবনাথ, *নারায়ণ দেবনাথ কমিক্স সমগ্র প্রথম খণ্ড*, স. দেবাশীষ দেব ও শান্তনু ঘোষ, কলকাতা: লালমাটি, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৬১।

১৯. নারায়ণ দেবনাথ, *বাঁটুল দি গ্রেট ১৭*, কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃ. ১-৩২।

২০. নারায়ণ দেবনাথ, *হাঁদা ভোঁদা সমগ্র,* কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, জুলাই ২০১১, পৃ. ৩০০।

২১. নারায়ণ দেবনাথ, *হাঁদা ভোঁদা সমগ্র,* কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, জুলাই ২০১১, পৃ. ৩৭৯।

২২. নারায়ণ দেবনাথ, *নারায়ণ দেবনাথ কমিক্স সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড,* স. চণ্ডী লাহিড়ি ও শান্তনু ঘোষ, কলকাতা: লালমাটি, অক্টোবর ২০১১, পৃ. ১৪১।

২৩. নারায়ণ দেবনাথ, *নারায়ণ দেবনাথ কমিক্স সমগ্র প্রথম খণ্ড,* স. দেবাশীষ দেব ও শান্তনু ঘোষ, কলকাতা: লালমাটি, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৫০।

২৪. নারায়ণ দেবনাথ, *নারায়ণ দেবনাথ কমিক্স সমগ্র প্রথম খণ্ড,* স. দেবাশীষ দেব ও শান্তনু ঘোষ, কলকাতা: লালমাটি, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬১।

২৫. সূচিপত্র, *শুকতারা,* শ্রাবণ ১৩৮০, কলকাতা।